بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ২৩ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিত বর্ণিত হচ্ছে। বিগত খুতবাগুলোতে (তাঁর) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার কথা আলোচিত হচ্ছিল এবং আজও এই প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বর্ণনা করব। তাঁর (সা.) ইবাদতের পদ্ধতি এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে পূর্বেও কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। আজও হাদীসের উদ্ধৃতির আলোকে এবং সেইসাথে মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে তাঁর (সা.) মাকাম ও মর্যাদা এবং ঐশীপ্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন– সে সম্পর্কেও কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ি। তিনি সূরা আল-বাকারা দিয়ে আরম্ভ করেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়ত একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন, কিন্তু তিনি আরো পড়তে থাকেন। এরপর আমি ভাবলাম, তিনি পুরো সূরাটি শেষ করে রুকু করবেন, কিন্তু তিনি আরো পড়তে থাকেন। এরপর আমি ভাবলাম, তিনি হয়ত এখন রুকু করবেন, কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করেন এবং তা পাঠ করেন। এরপর তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করেন এবং তা-ও পাঠ করেন। তিনি (সা.) অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ও থেমে থেমে তিলাওয়াত করছিলেন। যখনই তিনি এমন কোনো আয়াত পড়তেন যেখানে তসবীহ বা পবিত্রতা ঘোষণার উল্লেখ থাকত, তখন তিনি তসবীহ পাঠ করতেন। যখন প্রার্থনাসূচক কোনো আয়াত পাঠ করতেন, তখন তিনি প্রার্থনা করতেন এবং যখন এমন আয়াত পাঠ করতেন যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আশ্রয় চাওয়ার উল্লেখ থাকত, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর তিনি রুকু করেন এবং বলেন: سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ الْعَظِيمِ অর্থাৎ আমার প্রভু আল্লাহ্ পবিত্র, অত্যন্ত মহিমান্বিত। আর তাঁর রুকু তাঁর কিয়ামের (বা দণ্ডায়মান অবস্থার) মতোই ছিল, অর্থাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ রুকু ছিল। এরপর তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলেন, অর্থাৎ **আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে**। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করেন বা দাঁড়িয়ে থাকেন, যা তাঁর রুকুর কাছাকাছি (দীর্ঘ) ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং বলেন: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى অর্থাৎ আমার প্রভু পবিত্র, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। আর তাঁর সিজদা তাঁর কিয়ামের কাছাকাছি (দীর্ঘ) ছিল। এটি ছিল তাঁর (সা.) নফল নামায পড়ার রীতি যা একবার জনৈক সাহাবী প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাতে মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র আয়াত তিলাওয়াত করে পুরো কিয়াম সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর কিয়ামে একই আয়াত বার বার পড়তে থাকেন। পূর্বে একজন সাহাবীর বর্ণনায় বেশ কয়েকটি দীর্ঘ সূরা পড়ার কথা এসেছে; আর এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) একটি মাত্র আয়াতের ওপর দীর্ঘ কিয়াম করেছেন। আর তাঁর কিয়াম কত দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত

খুতবাগুলোতে আমি (হযরত আয়েশার এই কথা) বর্ণনা করেছি, তাঁর কিয়াম, রুকু এবং সিজদা এত দীর্ঘ হতো যে, তার সৌন্দর্য সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।

অনুরূপভাবে হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ইবাদতের জন্য দাঁড়ান এবং ভোর পর্যন্ত একটি আয়াতই বার বার পড়তে থাকেন। আর সেই আয়াতটি ছিল:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (সূরা আল-মায়েদা: ১১৯)

অর্থাৎ, যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্র সৃষ্টি ও বান্দাদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে যে সহমর্মিতার অনুভূতি ছিল, তার ফলে তিনি তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে থাকেন যে, যদিও আল্লাহ্ তা'লা তাদের শাস্তি দিতে সক্ষম, তবুও তিনি দোয়া করতে থাকেন যেন আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন, কারণ এই দোয়াটিও আল্লাহ্ তা'লাই শিখিয়েছেন।

আবার হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে; তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়। তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) নামায পড়ার জন্য দাঁড়ান। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম করেন। [গ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয়, সেটির কথা হচ্ছে।] এরপর রুকু করেন এবং অত্যন্ত দীর্ঘ রুকু করেন। এরপর নিজের মাথা উঠিয়ে অনেক দীর্ঘ কিয়াম করেন, যা প্রথম কিয়ামের চেয়ে কিছুটা কম ছিল। এরপর তিনি রুকু করেন এবং দীর্ঘ রুকু করেন যা প্রথম রুকুর চেয়ে কম ছিল। এরপর তিনি (সা.) সিজদা করেন। পুনরায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম করেন, যা পূর্বের কিয়ামের চেয়ে কম ছিল। এরপর রুকু করেন এবং দীর্ঘ রুকু করেন, যা পূর্বের রুকুর চেয়ে কম ছিল। এরপর নিজের মাথা তুলে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন, যা পূর্বের কিয়ামের চেয়ে কম ছিল। অতঃপর পুনরায় রুকু করেন এবং রুকু দীর্ঘ করেন, যা পূর্বের রুকুর চেয়ে কম ছিল। এরপর সিজদা করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন নামায শেষ করেন তখন সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন: সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। আর কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। অতএব যখন তোমরা (এদেরকে) এরূপ অবস্থায় দেখতে পাও, তখন আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করো, তাঁর নিকট দোয়া করো, নামায পড়ো এবং সদকা দাও।

এরপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মদের (সা.) উম্মত! আল্লাহ্র চেয়ে অধিক আত্মাভিমানী আর কেউ নেই যে, তাঁর কোনো বান্দা বা বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। [এটি অত্যন্ত হৃদয় কাঁপানো এক সতর্কবাণী যে, পাপে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানকে জাগ্রত কোরো না। আল্লাহ্ তা'লার কাছে রহমত অন্বেষণ করো এবং তাঁর আত্মাভিমানকে জাগ্রত করা থেকে বিরত থাক।] অতঃপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মদের (সা.) উম্মত! আল্লাহ্র কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা অনেক বেশি কাঁদতে এবং খুব কম হাসতে। এরপর তিনি বলেন, শোনো, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? অর্থাৎ আমি কি তোমাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? অতএব এভাবে তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার, তাঁর ইবাদত করার এবং তাঁর সামনে অবনত হবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি বলেন, এর মাঝেই তোমাদের স্থায়িত্ব এবং তোমাদের জীবন নিহিত। আর যদি তোমরা এসব বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে জানতে পারতে যেমনটি আমি জানি, তবে তোমরা হাসাহাসি ত্যাগ করতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করতে। সুতরাং এখানে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আমাদেরও দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত।

রণক্ষেত্রে মুনাজাত বা প্রার্থনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন মুশরিকদের দেখেন তখন তারা ছিল এক হাজার, আর তাঁর (সা.) সাহাবীগণ ছিলেন তিনশ ঊনিশজন। মহানবী (সা.) তখন কিবলার দিকে মুখ করেন, এরপর তিনি নিজের উভয় হাত প্রসারিত করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নিজের প্রভুকে (এই বলে) ডাকতে থাকেন:

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার সাথে যে ওয়াদা তুমি করেছ তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ্! যা আমাকে দেবার অঙ্গীকার করেছ তা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ্! যদি তুমি মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত করা হবে না।

কিবলার দিকে মুখ করে, উভয় হাত প্রসারিত করে তিনি (সা.) অবিরত নিজের প্রতিপালককে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন, এমনকি তাঁর (সা.) চাদর তাঁর কাঁধ থেকে নীচে পড়ে যায়। অর্থাৎ কান্নাকাটি করে দোয়া করার কারণে তাঁর (সা.) দেহও প্রকম্পিত হচ্ছিল, যার ফলে চাদরটিও পড়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) কাছে এসে চাদরটি উঠিয়ে তাঁর (সা.) কাঁধের ওপর রাখেন, এরপর মহানবী (সা.)-কে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আপনার প্রভুর সমীপে অনুনয়-বিনয় তথা কাকুতিমিনতিপূর্ণ দোয়াই তো আপনার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ (সূরা আল-আনফাল: ১০)

এটি সূরা আনফালের আয়াত। (এর অর্থ হলো,) **"স্মরণ করো সেই সময়কে যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালক-প্রভুর কাছে সকাতরে সাহায্য চাইছিলে; তখন তিনি এ মর্মে তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেন যে, 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে আগত এক সহস্র ফেরেশতা দিয়ে মাধ্যমে সাহায্য করব'।"** অতএব, আল্লাহ্ তা'লা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে বার বার মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ তথা বদরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন মহানবী (সা.) কান্নাকাটি ও দোয়া করতে আরম্ভ করেন আর দোয়া করতে করতে মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে এই শব্দগুলো নিঃসৃত হয়, اللَّهُمَّ إِنْ أَهْلَكْتَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি আজ এই (ক্ষুদ্র) দলটিকে ধ্বংস করে দাও যার মাঝে কেবল ৩১৩জন মানুষ রয়েছে,**

[অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৩১৯জন ছিলেন,] তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার ইবাদত করবে না। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে নিঃসৃত এই শব্দগুলো শোনেন তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কেন এত বেশি ব্যাকুল হচ্ছেন? আল্লাহ্ তা'লা তো আপনাকে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি বিজয় দান করবেন। তিনি (সা.) বলেন, একথা সত্য, কিন্তু আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তাঁর অমুখাপেক্ষিতার প্রতি। অর্থাৎ, কোনো প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আল্লাহ্ তা'লার জন্য একান্ত অপরিহার্য নয়। এখন প্রণিধান করা উচিত, যেখানে মহানবী (সা.) স্বীয় প্রভুর আদব বা শিষ্টাচার রক্ষার ক্ষেত্রে এতটাই যত্নশীল ছিলেন, তাহলে সকল নবীর (আলাইহিমুস্ সালাম) এই সর্বসম্মত স্বীকৃত বিশ্বাসকে কীভাবে উপক্ষো করা যেতে পারে যে, খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনো আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হয় আবার কখনো রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থেও পূর্ণ হয়?

এ ঘটনা বর্ণনা করে তিনি (আ.) তাঁর বিরোধীদেরকেও উত্তর দিয়েছেন যারা আপত্তি করে যে, তাঁর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয় নি। [তিনি বুঝিয়েছেন,] ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হবারও ভিন্ন ভিন্ন ধরন রয়েছে। কখনো বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হয় আবার কখনো ভিন্নভাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করেন। আমাদের সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত থাকা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লার অমুখাপেক্ষিতার কারণে তাতে কোনো প্রকার ছেদ না পড়ে, এটি শেষ হয়ে না যায়। বরং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন যেন আমাদের নিত্যসঙ্গী থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ভালোভাবে মনে রাখবে, প্রকৃত একত্ববাদী তারাই যারা বিন্দুমাত্রও নিজেদের পুণ্যের বাগাড়ম্বর করে না কিংবা সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে জগৎ সংসারকে ভয়ও পায় না। তাদের কোনো কাজে যদি জগৎ বিরূপ হয়, তবে তারা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। অনেকে বলে, সাহাবীরা যে পরিমাণ কঠোর সংগ্রাম করতেন বা রোযা রাখতেন, মহানবী (সা.)-এর কর্ম দ্বারা তেমনটি প্রমাণিত নয়। সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায় বৈরাগ্যের জীবন যাপন করতেন। অর্থাৎ ধর্মের প্রতি তাদের এত বেশি আসক্তি জন্মেছিল যে, তারা পুরোপুরি সংসার পরিত্যাগ করেছিলেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে, নাউযুবিল্লাহ্, তারা আধ্যাত্মিকতায় মহানবী (সা.)-এর চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-কে তো আল্লাহ্ তা'লা জোরপূর্বক প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন এবং (তাঁর) প্রেমে বিভোর ছিলেন। তাঁর (সা.) জীবনের শয়ন-স্বপন-জাগরণ তথা সবকিছুই ছিল আল্লাহ্ তা'লার সত্তাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জোরপূর্বক তাঁকে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর (সা.) নিজেকে আড়াল করার সেই স্বভাব কিন্তু দূর হয় নি। কেউ কি জানে– তিনি গোপনে ও নিভৃতে কীরূপ চেষ্টাসাধনা ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন?"

একইভাবে কবরস্থানের ঘটনাটিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণনা করে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিজেকে আড়াল রাখার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-র ঘরে একদিন যখন [মহানবী (সা.)-এর] পালা ছিল, তার (রা.) ঘুম ভাঙলে তিনি লক্ষ করেন, মহানবী (সা.) (ঘরে) নেই। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন, খুঁজতে থাকেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে কবরস্থানে গিয়ে দেখতে পান, সেখানে অত্যন্ত কাকুতিমিনতির সাথে তিনি (সা.) দোয়া করছেন– **'হে আমার আল্লাহ্! আমার আত্মা, আমার প্রাণ, আমার প্রতিটি অস্থি ও প্রতিটি পশম তোমাকে সিজদা করছে।'** মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ঘটনাকে

এভাবে বর্ণনা করেন যে, “হযরত আয়েশা (রা.) যদি এ বিষয়ে অবগত না হতেন তাহলে কে জানতে পারত যে, মহানবী (সা.) তাঁর প্রতিপালক-প্রভুর সাথে কীরূপ সম্পর্ক রাখতেন, কী পরিমাণ ইবাদত করতেন, কীভাবে গোপনে ও নিভৃতে তিনি ইবাদত করছেন? এমনটিই ছিল তাঁর চেষ্টাসাধনা ও ইবাদতের অবস্থা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা সেসব ব্যক্তির স্বভাবে এটি প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, তাঁরা গোপনীয়তা অবলম্বন করেন, যার ফলে পৃথিবীবাসী তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতও থাকে না। তাঁরা তো জগৎ লাভের জন্য কিছুই করেন না। যাঁর সাথে তাঁদের সম্পর্ক বা লেনদেন, তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করেন, তাঁরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসেন এবং তিনি সব কিছুই জানেন। তাঁরা জগদ্‌বাসীকে দেখানোর জন্য কোনো কাজ করেন না।”

অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, “মহানবী (সা.)-এর পার্থিব ভোগবিলাস বা জাগতিক সাজসরঞ্জামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। একজন বালককে পাঠিয়ে অনুমতি চান। মহানবী (সা.) একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়ে ছিলেন। যখন হযরত উমর (রা.) ভেতরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি (সা.) উঠে বসেন। হযরত উমর (রা.) লক্ষ করেন, ঘরটি একেবারে খালি পড়ে আছে এবং সৌন্দর্যবর্ধক কোনো আসবাবপত্র সেখানে নেই। একটি খুঁটিতে একটি তরবারি ঝুলছে আর সেই চাটাইটি রয়েছে যার ওপর তিনি (সা.) শুয়ে ছিলেন, যার দাগ সেভাবেই তাঁর পিঠে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। হযরত উমর (রা.) তাঁকে [এ অবস্থায়] দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, হে উমর! তোমাকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, কিসরা ও কায়সার (তথা রোমান ও পারস্য সম্রাট) তো ভোগবিলাসের উপকরণ রাখে; [তাদের কাছে সকল আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ রয়েছে;] আর আপনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল এবং উভয় জগতের বাদশা হয়েও এমন অবস্থায় আছেন যে, চাটাইয়ে শুয়ে থাকার ফলে (শরীরে) দাগ পড়ে গেছে! মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! পৃথিবীর সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমি তো সেই পথিকের ন্যায় দিনাতিপাত করি যে উটে চড়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে; মরুর পথে সে তীব্র গরমের কারণে কোনো গাছ দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় আর ঘাম কিছুটা শুকিয়ে যেতেই আবার যাত্রা আরম্ভ করে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫) অর্থাৎ **'আর তুমি সর্বপ্রথম তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো'**– তখন মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে কুরাইশ সদস্যরা! তোমরা নিজেদের প্রাণের (সওদা) বিনিময় করে নাও; আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমি তোমাদের কোনো কাজে আসব না। অর্থাৎ যদি তোমরা পুণ্যকাজ করো এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অনুরক্ত হও, তাঁর ইবাদত করো, তাঁর প্রেমে বিভোর হও– তবেই ক্ষমা লাভ করবে; অন্যথায় আমি তোমাদের কোনো কাজে আসব না। এরপর তিনি নিজের অন্যান্য আত্মীয় ও গোত্রসমূহকে সম্বোধন করে বলেন, হে বনী আব্দে মানাফ! আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তোমাদের কোনো কাজে আসব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তোমার কোনো কাজে আসব না। হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ফুফু সাফিয়া! আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তোমার কোনো উপকারে আসব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি যত ইচ্ছা আমার সম্পদ থেকে চেয়ে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র সমীপে

তোমাদের কোনো কাজে আসব না। অর্থাৎ, তোমাদের ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের সম্পর্কই তোমাদেরকে রক্ষা করবে।

আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রেম ও ভালোবাসার বিপরীতে তিনি (সা.) নিজের প্রাণের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তবলীগ করতে লাগলেন তখন কুরাইশ আবু তালিবের কাছে গেল এবং তাকে বলল, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের উপাস্যদের ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখুন। নতুবা আমরা স্বয়ং তাকে বাধা দেবো; তখন কিন্তু আপনার এতে হস্তক্ষেপ করা চলবে না! তারা বলল, আমরা আপনার কাছে আগেও আবেদন করেছিলাম যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিরত রাখুন; পূর্বেও আমরা বলেছিলাম আপনাকে। কিন্তু আপনি তাকে বাধা দেন নি। এখন আমরা আবার এসেছি, হয় আমরা তাকে আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলা বন্ধ করিয়ে ছাড়ব, নতুবা তার এবং আপনার সাথে মোকাবিলা করব, যতক্ষণ না দুই পক্ষের মাঝে কোনো এক পক্ষ ধ্বংস হয়ে যায়। কুরাইশ যখন আবু তালিবকে এ কথা বলল তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে (সা.) বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ধারণা করলেন, তাঁর চাচা তাঁকে সাহায্য করা ছেড়ে দেবেন এবং তাঁকে কুরাইশের হাতে সোপর্দ করে দেবেন। এতে তিনি (সা.) বললেন, আমার প্রিয় চাচা! আল্লাহ্‌র কসম! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে রেখে দেয়, তবুও আমি নিজের দায়িত্ব থেকে বিরত হবো না। আমি নিজের কাজ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আল্লাহ্ সেটিকে পূর্ণতা দান করেন, অথবা আমি এই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করি। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হন; তখন আবু তালিব তাঁকে ডেকে বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যা ইচ্ছে করো। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো মূল্যেই তোমাকে কক্ষনো তাদের হাতে তুলে দেবো না! এই ঘটনাটি সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো যে, মুশরিকরা অপবিত্র, নোংরা, 'শাররুল বারিয়্যা' অর্থাৎ নিকৃষ্ট সৃষ্টি, 'সুফাহা' তথা নির্বোধ, শয়তানের বংশধর; আর তাদের উপাস্যরা 'ওয়াকুদুন নার' অর্থাৎ আগুনের ইন্ধন, 'হাসাবু জাহান্নাম' তথা জাহান্নামের ইন্ধন, তখন আবু তালিব মহানবী (সা.)-কে ডেকে বলেন, হে আমার ভাতিজা! এখন তোমার প্রকাশ্য নিন্দায় জাতি ভীষণ ক্ষিপ্ত; খুব সম্ভব তারা তোমাকে হত্যা করবে, সেইসাথে আমাকেও। তুমি তাদের বুদ্ধিমানদের নির্বোধ আখ্যা দিয়েছ এবং তাদের গুরুজনদেরকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলেছ এবং তাদের সম্মানিত উপাস্যদের নাম জাহান্নামের ইন্ধন ও আগুনের ইন্ধন রেখেছ; সাধারণভাবে তাদের সবাইকে অপবিত্র, শয়তানের বংশধর ও নোংরা আখ্যায়িত করেছ। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি, নিজের জিহ্বাকে সংযত করো এবং অপমানসূচক মন্তব্য থেকে বিরত হও। নতুবা জাতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা আমি রাখি না। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, হে চাচা! এটি অপমানসূচক মন্তব্য নয়, বরং এ হলো সত্যকথন ও প্রকৃত বিষয় উপযুক্ত স্থানে বর্ণনা করা। আর এ কাজের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি এর কারণে আমার মরণ আসে তবে আমি সানন্দে নিজের জন্য এই মৃত্যুকে গ্রহণ করছি। আমার জীবন এই পথে উৎসর্গিত, আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। হে চাচা! যদি আপনার নিজের দুর্বলতা ও নিজের কষ্টের বিষয়ে দুশ্চিন্তা থাকে তাহলে আপনি আমাকে নিজ আশ্রয়ে রাখা

থেকে বিরত হয়ে যান। আল্লাহ্র কসম! আপনাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ঐশী আদেশাবলি পৌঁছে দেওয়া থেকে কখনো বিরত হবো না। আমার কাছে আমার প্রভুর নির্দেশ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি এই পথে নিহত হই, তবে আমি চাইব যেন বার বার জীবিত হয়ে পুনরায় এই পথেই প্রাণ বিসর্জন দিই। এটি ভয়ের কোনো বিষয় নয়, বরং তাঁর পথে কষ্ট সহ্য করার মাঝে আমি এক অশেষ আনন্দ অনুভব করি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর বিশদ বিবরণে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবন খোদার প্রেমে নিমগ্ন ছিল। জামা'তের বড়ো বড়ো দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) দিন-রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অর্ধরাত অতিবাহিত হলে তিনি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি যেহেতু সত্য যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাকে তাঁর সান্নিধ্য দান করেছেন, সেহেতু এটি কি আমার দায়িত্ব নয় যে, আমি যতটা সম্ভব তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করি? কেননা কৃতজ্ঞতা মূলত অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমার উচিত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

একইভাবে তিনি (সা.) কখনো বড়ো কোনো কাজ আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ছাড়া করতেন না। যখন আল্লাহ্র নির্দেশ আসত তখনই তিনি তা করতেন। আমরা দেখতে পাই, মক্কাবাসীদের তীব্র নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করেন নি যতক্ষণ না খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মক্কাবাসীদের অত্যাচারের তীব্রতা দেখে তিনি যখন সাহাবীদের আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন, আর তারা এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে, তিনিও যেন তাদের সফরসঙ্গী হন, তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য এখনও কোনো আদেশ আসে নি, এর অনুমতি দেওয়া হয় নি। অত্যাচার ও দুঃখকষ্টের সময় যখন মানুষ নিজ বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের নিজের চারপাশে সমবেত করে নেয়, তখন তিনি (সা.) নিজ জামা'তকে আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নিজে একাকী মক্কায় অবস্থান করেন। কারণ তাঁর প্রভু তখনো তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেন নি।

যখন তিনি আল্লাহ্র পবিত্র কালাম শ্রবণ করতেন তখন নিজেকে আর সামলাতে পারতেন না, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত; বিশেষভাবে সেই সব আয়াত শুনে যেখানে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, আমাকে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত পড়ে শোনাও। আমি এর উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্র রসূল! কুরআন তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আপনাকে কী শোনাবো? তিনি বলেন, আমি অন্যদের কাছ থেকেও কুরআন পাঠ শুনতে পছন্দ করি। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করা আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছাই,

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا (সূরা আন-নিসা: ৪২)

অর্থাৎ, 'অতএব তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক জাতির নবীকে তার জাতির সামনে উপস্থিত করে সেই জাতির হিসাব নেব আর তোমাকেও তোমার জাতির

সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের হিসাব গ্রহণ করব?’ তখন মহানবী (সা.) বলেন, থামো, থামো! আমি তাঁর (সা.) দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। এই ঘটনা পূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু যতবার আমরা এটি শুনি, আল্লাহ্ তা’লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভয় ও খোদাপ্রেমের এক নতুন চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

ঐশী ভালোবাসা প্রসঙ্গে তায়েফ সফরে তাঁর আহত হবার ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। নবুওয়তের দশম বছরে আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশ যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর নির্যাতন আরম্ভ করে, তখন তিনি তায়েফে গমন করেন। তিনি (সা.) দশ দিন তায়েফে অবস্থান করেন এবং ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন কিন্তু কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি। তায়েফের নেতারা যখন আশঙ্কা করল, যুবসমাজ হয়ত তাঁর (সা.) আহ্বানে সাড়া দেবে; এমন যেন না হয়– বার বার বলার ফলে তারা তা গ্রহণ করে ফেলবে; তাই তারা বাউন্ডুলে ও দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দিল। তারা তাঁর (সা.) ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল, এমনকি তাঁর উভয় পা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল। হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পাথর আসলে হযরত যায়েদ সেগুলো নিজের শরীর দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতেন, ফলে তার মাথায়ও একাধিক আঘাত লাগে। সহীহ বুখারীতে এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি একবার মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, উহুদের দিনের চেয়েও কি আপনার ওপর বেশি কঠিন কোনো দিন এসেছিল, যেদিন আপনি আহত হয়েছিলেন? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেছিলেন, তোমার জাতির পক্ষ থেকে যে কষ্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে তা ছিল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক; আকাবার দিনটি ছিল আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টের দিন। অর্থাৎ যেদিন আমি তায়েফে ইবনে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের সামনে উপস্থিত হয়ে (তার কাছে ইসলামের) বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে কাঙ্ক্ষিত জবাব দেয় নি। অতএব আমি সেখান থেকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিলাম। যখন আমি কারনুস সাআলিব পৌঁছালাম যা মিনার নিকটবর্তী একটি ছোটো পাহাড়, তখন আমার মন কিছুটা হালকা হলো। আমি মাথা তুলে দেখি, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি লক্ষ করলাম, সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ আপনার ব্যাপারে আপনার জাতির কথা শুনেছেন; অর্থাৎ তারা আপনার সঙ্গে যা করেছে এবং যে জবাব দিয়েছে– সবই আল্লাহ্ শুনেছেন। আর আল্লাহ্ পাহাড়ের ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দেয় ও বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি এ ব্যাপারে যা চান আদেশ করুন। আপনি যদি চান তবে আমি এই দুটি পাহাড় তাদের ওপর চাপিয়ে দিই; অর্থাৎ তাদের ওপর নিপতিত করি এবং তারা তাতে চাপা পড়ুক। তখন মহানবী (সা.) বলেন, না। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। এখানেও মহানবী (সা.)-এর দয়া ও সহানুভূতি প্রাধান্য পেল আর তিনি সেই জাতিকে রক্ষা করলেন। এরপর মক্কা বিজয়ের কিছুদিনের মাঝেই তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করে।

মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই সর্বোচ্চ স্তরের নূর যা মানুষকে অর্থাৎ ‘ইনসানে কামিল’ (সা.)-কে প্রদান করা

হয়েছে তা ফেরেশতাদের মধ্যেও ছিল না, নক্ষত্রের মাঝে ছিল না, চাঁদে ছিল না, সূর্যেও ছিল না, তা পৃথিবীর সমুদ্র ও নদনদীতেও ছিল না, তা হীরা-চুনি-পান্না কিংবা দামি কোনো মণিমুক্তার মাঝেও ছিল না, সর্বোপরি তা কোনো পার্থিব কিংবা ঐশী বস্তুর মাঝেই ছিল না; তা ছিল কেবল মানবের মাঝে, অর্থাৎ সেই পরিপূর্ণ মানবের মাঝে, যার সর্বোচ্চ, পরিপূর্ণ, মহান ও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের নেতা ও মনিব, নবীগণের সর্দার, প্রতিটি প্রাণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। অতএব সেই নূর সেই (পরিপূর্ণ) মানবকে দেওয়া হয়েছে এবং স্তরভেদে তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণদেরও দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে যারা কিছুটা তাঁর রঙে রঙিন। অর্থাৎ যারা তাঁর মান্যকারী ও তাঁর সুন্নত অনুসরণকারী– তাদেরকেও তা দান করা হয়েছে।

এরপর তিনি (আ.) 'মানুষের ওপর অর্পিত আমানত কী'– এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমানত বলতে পরিপূর্ণ মানবের যাবতীয় শক্তিনিচয়, বুদ্ধি, জ্ঞান, হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ভয়, ভালোবাসা, সম্মান, মর্যাদা এবং সব রকমের আত্মিক ও দৈহিক নিয়ামতকে বুঝায়, যা আল্লাহ্ তা'লা পরিপূর্ণ মানুষকে দান করে থাকেন। অতঃপর পরিপূর্ণ মানব কুরআনের এ আয়াত إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (সূরা আন-নিসা: ৫৯) (অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করো) অনুযায়ী সকল আমানত আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে তাঁরই পথে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে-সব আমানত অর্পণ করেছিলেন, আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের সেই সমুদয় শক্তিই ব্যয় করেন, যেন আমানতের পূর্ণ হক আদায় করা যায় আর আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও প্রেম আরো অধিক অর্জিত হয়।

অতএব এটি সেই আমানতের সর্বোচ্চ স্তর যা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় বিলীন হয়ে তিনি (সা.) লাভ করেছিলেন। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই মর্যাদা সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণরূপে আমাদের সাইয়্যেদ, আমাদের মওলা, আমাদের পথপ্রদর্শক, উম্মী ও সত্যবাদী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল, যার উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

(সূরা আল-আনআম: ১৬৩-১৬৪)

আরও বলেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(সূরা আল-আনআম: ১৫৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (সূরা আলে-ইমরান: ৩২)

অতঃপর তিনি বলেন:

فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ (সূরা আলে-ইমরান: ২১)

অতঃপর আরও বলেন:

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল-মু'মিন: ৬৭)

অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, 'নিশ্চয় আমার নামায ও আমার ইবাদত, চেষ্টাসাধনা, কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব বিশ্বজগতের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহ্‌রই জন্য।

সেই খোদা– যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক-প্রভু, যাঁর কোনো শরীক নাই। আর আমাকে এরই আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মাঝে সর্বপ্রথম।' অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মতো আর কোনো পরিপূর্ণ মানব নেই যে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় এতটা বিলীন হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত আমানত তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ আয়াতে সেই অজ্ঞ একেশ্বরবাদীদের বিশ্বাসের খণ্ডন রয়েছে যারা আমাদের নবী (সা.)-কে অন্য সব নবীর ওপর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে না এবং দুর্বল হাদীসসমূহ উপস্থাপন করে বলে, মহানবী (সা.) নিজেকে ইউনুস বিন মাত্তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করেছেন। এই অজ্ঞরা বোঝে না, এই হাদীস যদি সঠিকও হয় তবুও এটি নিতান্ত দীনতা ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ যা আমাদের নেতা মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল। প্রতিটি কথার একটি প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা থাকে। কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি যদি তার চিঠিতে 'আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নগণ্য বান্দা' লেখে তাহলে কি এটি ধরে নিতে হবে যে, এ ব্যক্তি সত্যিই সারা পৃথিবীর মাঝে, এমনকি সকল মূর্তিপূজারি ও পাপিষ্ঠের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং নিজেই ঘোষণা দিচ্ছে, সে আল্লাহ্‌র নিকৃষ্টতম বান্দা? এটা কত বড়ো অজ্ঞতা এবং দুষ্টামি! গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নাম 'আউয়ালুল মুসলিমীন' রেখেছেন আর সকল অনুগত ও বাধ্যগত মানুষের নেতা নিযুক্ত করেছেন এবং সর্বাগ্রে আমানত প্রত্যর্পণকারী হিসাবে মহানবী (সা.)-কে আখ্যায়িত করেছেন, এরপরও কি কুরআন করীমে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে কোনো আপত্তি করতে পারে? উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আত্মসমর্পণের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করার পর সকল স্তরের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ স্তর সেটিকেই আখ্যায়িত করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর স্বভাব ও প্রকৃতিতে দান করা হয়েছে।

অবশিষ্টাংশের অনুবাদ, অর্থাৎ যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয়েছিল সেগুলোর অনুবাদ হলো: মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে বলেন, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার যে পথ (মতাদর্শ) আছে সেটিই সরল-সঠিক পথ (মতাদর্শ)। তাই তোমরা এর অনুসরণ করো আর অন্য কোনো পথে চলো না, কেননা সেগুলো তোমাদেরকে খোদা তা'লা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বলেন, (তুমি) তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা রাখো তবে আসো, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো। অর্থাৎ আমার পথ ও আদর্শ অবলম্বন করো যা ইসলামের সর্বোত্তম মর্ম– সেদিকে অগ্রসর হও, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (তুমি) তাদেরকে বলে দাও, আমার পথ হলো– আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন নিজের পুরো সত্তা খোদা তা'লাকে সমর্পণ করি এবং নিজেকে রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের জন্য একনিষ্ঠ করি; অর্থাৎ তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে– যেভাবে তিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক– আমিও যেন সেভাবে বিশ্বজগতের সেবক হই, আর কায়মনোবাক্যে তাঁর এবং তাঁর পথে নিবেদিত হয়ে যাই। তাই আমি আমার পুরো সত্তা এবং যা কিছু আমার ছিল– তা খোদা তা'লাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার আর কিছুই নেই; যা কিছু আমার আছে তা সব তাঁরই।

মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার এটি সেই প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন আর যা তিনি (আ.) আমাদের জন্যও বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের বলে, আমরা নাকি

(নাউযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অধিক মর্যাদা দান করি! আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে রক্ষা করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ, (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম,) তিনি কত-না উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁর (সা.) উচ্চ মোকাম বা পদমর্যাদার সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতা অনুমান করা মানুষের কাজ নয়। পরিতাপ! তাঁর (সা.) মর্যাদা যেভাবে শনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে শনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ যিনি পুনরায় তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি (সা.) খোদা তা'লাকে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত ভালোবেসেছেন এবং মানবজাতির প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালোবাসায় তাঁর প্রাণ বিগলিত হয়েছে। এজন্যই খোদা তা'লা– যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন– তাঁকে সকল নবী এবং সমস্ত 'আওয়ালীন ও আখিরীন' অর্থাৎ প্রথম ও শেষ যুগের ব্যক্তিবর্গের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন আর তাঁর (সা.) কাঙ্ক্ষিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করেছেন। তিনিই (সা.) প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনো প্রকারের কোনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, সে মানুষ নয় বরং সে শয়তানের বংশধর। কেননা প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই (সা.) দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধনভাণ্ডার তাঁকেই (সা.) দান করা হয়েছে। যে তাঁর (সা.) মাধ্যমে (এই ধনভাণ্ডার) না পায়, সে চিরবঞ্চিত। আমি কী আর আমার অস্তিত্বই বা কী! আমি তাঁর (সা.) অনুগ্রহরাজির অস্বীকারকারী হবো যদি আমি এ কথা স্বীকার না করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি, আর জীবন্ত খোদার পরিচয় আমি ঐ পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ নবীর মাধ্যমেই এবং তাঁরই জ্যোতির মাধ্যমে পেয়েছি। খোদার সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপের সৌভাগ্যও ঐ মহান নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা প্রত্যক্ষ করে থাকি। হিদায়াতের এই সূর্যের কিরণ আমাদের ওপর প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমরা আলোকিত থাকতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকি। যাদের মাঝে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধপরিকর হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান না এনেও, কিংবা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে, সে-ও মুক্তি পেয়ে যাবে এবং ঈমান না আনার বা মুরতাদ হবার দরুন তার কোনোই ক্ষতি হবে না– এমন ব্যক্তিরা বস্তুত তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ। কেবল আল্লাহ্কে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করার দরুন নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ হতে পারে না; বরং নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। [দুটি বিষয়ের মাধ্যমে নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ হয়ে থাকে।] প্রথমত, খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার (এমন) পরিপূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টি হতে হবে যার প্রাধান্যের ফলে খোদা তা'লার আনুগত্য তার আত্মার প্রশান্তির কারণ হয়ে যায়, যেটি ব্যতীত সে বাঁচতেই পারে না, আর তাঁর ভালোবাসা অন্য সবকিছুর ভালোবাসাকে পদদলিত এবং (পরিপূর্ণরূপে) বিলুপ্ত করে দেবে। এটিই প্রকৃত একত্ববাদ যা আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত অর্জন করা সম্ভবই নয়। কেন অর্জন করা সম্ভব নয়? এর উত্তর হলো, খোদার সত্তা

একান্ত অদৃশ্য, অসংখ্য পর্দার আড়াল এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম যা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির বলে আবিষ্কার করা (তথা জানা) সম্ভব নয় এবং কোনো যৌক্তিক দলিল তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ হতে পারে না। কেননা বুদ্ধিমত্তার সাধনা ও প্রচেষ্টা কেবল এই পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ করে এর সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু (সৃষ্টিকর্তার) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক বিষয়, আর চাক্ষুস জ্ঞান অর্জনের স্তরে উপনীত হওয়া যে, সেই খোদা সত্যিই বিদ্যমান যাঁর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে– তা ভিন্ন বিষয়। [বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কেবল এতটুকু অবগত হওয়া সম্ভব যে, খোদা বা স্রষ্টা আছেন; যেমনটি অনেক লোকই একথা বলে থাকে। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই, কে সেই সত্তা?] আর যেহেতু বুদ্ধিমত্তার পন্থা দুর্বল, অপরিপূর্ণ এবং সন্দেহযুক্ত, এজন্য প্রত্যেক দার্শনিক কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে খোদাকে শনাক্ত করতে পারে না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন মানুষ যারা নিছক বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'লার সন্ধান করতে চায়, তারা পরিশেষে নাস্তিক হয়ে যায় এবং পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় না, আর খোদা তা'লার মনোনীত ব্যক্তিদের বিষয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রুপ করে থাকে। তাদের যুক্তি হলো, পৃথিবীতে এমন হাজারো জিনিস রয়েছে যার অস্তিত্বের আমরা বাহ্যত কোনো প্রকার সুফল পাই না এবং সেসকল বিষয়ে আমাদের যুক্তিভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে এমন কোনো সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয় না, যা কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। [বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিন্তা করার কারণে কতিপয় জিনিস তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যেগুলোর অস্তিত্বের কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ নেই যে, (এগুলো) কীভাবে সৃষ্টি হলো। বরং তাদের মতে এই জিনিসগুলোর অস্তিত্ব নিতান্ত অর্থহীন ও বৃথা; সেসকল লোক এমনটিই বলে থাকে।] পরিতাপ! এই হতভাগারা জানেই না, কোনো বিষয়ে অজ্ঞতার অর্থ এটি নয় যে, সেই বিষয়টির কোনো অস্তিত্বই নেই। [কোনো একটি জিনিস সম্পর্কে যদি কেউ না জানে, তবে এর অর্থ এটি নয় যে, সেই জিনিসটির অস্তিত্বই নেই।] এই যুগে এমন চিন্তাধারার কয়েক লক্ষ মানুষ রয়েছে– [আর বর্তমানে তো তা কোটি কোটি সংখ্যায় রয়েছে;] যারা নিজেকে প্রথম সারির বুদ্ধিমান ও দার্শনিক মনে করে এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বের চরম বিরোধী। এখন এটি স্পষ্ট যে, যদি তাদের কাছে কোনো জোরালো যৌক্তিক প্রমাণ থাকত তবে তারা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করত না। আর যদি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে থাকত, তবে তারা চরম নির্লজ্জতা, উপহাস ও বিদ্রুপের মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হতো না। অতএব কোনো ব্যক্তি দার্শনিকদের নৌকায় চড়ে সন্দেহের ঝড় থেকে রক্ষা পেতে পারে না; [অর্থাৎ দার্শনিকদের সাথে ওঠাবসা করলে, তাদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী চললে তোমরা (আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে) সন্দেহ থেকে মুক্তি পেতে পারবে না। এ সকল দার্শনিকদের অন্তরে সন্দেহের একটি ঝড় চলমান যার ফলে তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে;] বরং তারা অবশ্যই ডুবে মরবে এবং কখনো কোনোভাবেই তওহীদের বিশেষ অমিয় সুধা তারা লাভ করতে পারবে না। এখন চিন্তা করে দেখো! এই ধারণা কত ভ্রান্ত ও দুর্গন্ধময় যে, মহানবী (সা.)-এর উসিলা বা মধ্যস্থতা ছাড়াও তওহীদ লাভ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে! [তওহীদ সম্পর্কে জানতে হলে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, পবিত্র কুরআন বুঝতে হবে।] হে নির্বোধেরা! আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না জন্মানো পর্যন্ত কীভাবে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করা সম্ভব? সুতরাং নিশ্চিতভাবে

জেনে নাও, সুনিশ্চিত ও খাঁটি তওহীদ কেবলমাত্র কোনো নবীর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব, ঠিক যেভাবে আমাদের নবীজি (সা.) আরবের নাস্তিক এবং পৌত্তলিকদের হাজার হাজার ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন আর এখন পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পরিপূর্ণ অনুসরণকারীরা এ নিদর্শনাবলিকে নাস্তিকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকে। প্রকৃত সত্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত ঐশীশক্তি প্রত্যক্ষ না করে, (ততক্ষণ পর্যন্ত) শয়তান তার হৃদয় থেকে বিতাড়িত হয় না এবং খাঁটি তওহীদ তার হৃদয়ে প্রবেশ করে না আর সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসীও হতে পারে না। আর এ পবিত্র ও খাঁটি তওহীদ কেবলমাত্র মহানবী (সা.)-এর কল্যাণেই লাভ করা সম্ভব। আর এ যুগে সেই শিক্ষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আরবের মরুভূমিতে যে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল আর লক্ষ লক্ষ মৃত (তথা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত) কয়েকদিনের মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করেছিল এবং বংশপরম্পরায় পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও ঐশী রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিল, অন্ধরাও দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিল এবং বোবাদের মুখ থেকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান নির্গত হয়েছিল আর পৃথিবীতে সহসা এরূপ এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্বে কোনো চোখ দেখে নি এবং কোনো কান শোনে নি; তোমরা কি জানো, সেটি কী ছিল? তা ছিল আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন এক ব্যক্তির অন্ধকার রাতের দোয়া, যিনি পৃথিবীতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং সেই সমস্ত আশ্চর্যজনক কাজ করে দেখিয়েছেন যা সেই নিরক্ষর ও অসহায় ব্যক্তির পক্ষে সাধন করা অসম্ভব বলে মনে হতো।

اللهم صل وسلم وبارک علیه وآله بعدد همه وغمه وحزنه لهذه الامة وانزل علیه انوار رحمتک الی الابد

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি ওয়া আলিহী বিআদাদি হাম্মিহী ওয়া গাম্মিহী ওয়া হুযনিহী লিহাযিহিল উম্মাতি ওয়া আনযিল আলাইহি আনওয়ারা রাহমাতিকা ইলাল আবাদ।)

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি আশিস, শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করো, তাঁর সেই সকল দুশ্চিন্তা, দুঃখকষ্ট এবং বেদনার বিনিময়ে যা তিনি এ উম্মতের জন্য সহ্য করেছেন, আর তুমি নিজ কৃপার জ্যোতিসমূহ মহানবী (সা.)-এর প্রতি চিরস্থায়ীভাবে অবতীর্ণ করো। তিনি (আ.) বলেন, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি অবলোকন করছি যে, দোয়ার প্রভাব পানি ও আগুনের প্রভাব থেকেও অধিক কার্যকর; বরং প্রাকৃতিক উপকরণের মাঝে কোনোই বস্তু দোয়ার মতো অতুলনীয় প্রভাবসঞ্চারী নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ পথে ধাবমান থেকে দোয়া করার এবং গ্রহণীয় দোয়া করার তৌফিক দান করুন, প্রকৃত অর্থে দোয়া করার সামর্থ্য দিন ও সত্যিকার অর্থে সেরূপ প্রকৃত মু'মিন হবার তৌফিক দান করুন, যারা দোয়ার হক আদায়কারী হবে এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শানুযায়ী চলার জন্য চেষ্টাসাধনাকারী হবে। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)